Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 321 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 321 – 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মধুর জীবন আলেখ্য : মধুময় তামরস

উজ্জ্বলা সূত্রধর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ujjalasutradhar95@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Madhusudan, 21st Century, Hero, Personal Life, Novel, Variety, Poor, Epic, Drama.

Abstract
Michael Madhusudan Dutta is a memorable figure who created a revolution in Bengali consciousness in the 19th century. His life is not the life of an ordinary person. Like the hero of the epic, his life has many variations, many ups and downs and complex conflicts. Michael Madhusudan Dutta, one of the pioneers of the 19th century renaissance in whole Bengal, is one of those people whose life becomes a yardstick for determining the direction of a country's socio-culture-history-tradition. Such people become heroes of the times. Attempts to write novels centered on such a hero can be seen more or less in the literature of almost all languages. Bengali language is no exception. A beautiful example of this can be seen in Samiran Das's epic novel 'Madhumoy Tamaras'.

We see that Bengali worthwhile novels started to be written from the 19th century, but in the latter half of the 20th century, the writing of novels based on Bengali personal life began. In the 21st century came the tide in the literary works of this genre. At this time, Samiran Das wrote 'Madhumoy Tamaras' based on the life story of Michael Madhusudan, a revolutionary figure in Bengali poetic literature. From Madhusudan's birth on 25th January 1824 AD to his death on 29th June 1873 AD, almost all the events of Kishore Madhusudan's life from his admission in Hindu College to his burial after his death are described in this large novel. That is, the novel is based on the life of Madhusudan. But even if Michael's life is at the root of the novel, whether the novel can be called a novel based on personal life, we will judge with logic in this research article. Besides, it will be seen why the novelist wrote such a novel in the present time and the relevance of the novel in the present time will also be analyzed.

Discussion

“এলো সে বাংলার শ্যামল মাটিতে-কপোতাক্ষ নদের তীরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে। কী দাহ সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের! সে দাহ মহতী কামনার দাহ-এক বিপ্লবী-চিত্তের যন্ত্রণাদাহ। দেহ তাকে ধারণ করতে পারেনি। জীবনে নিষ্ফল, কিন্তু কাব্যলোকে অমর।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 321 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> দৈবী-প্রতিভা নিয়েই এসেছিল সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শে বাংলা কাব্যের কুঁড়েঘর যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল কুসুমদাম-সজ্জিত এক বিরাট প্রাসাদে। ধ্বনিত হলো এক সঙ্গে তুমুল মেঘ-গর্জন ও সিংহনাদ।"[১]

মণি বাগচীর এক উদ্ধৃতি থেকেই আমরা মধুসূদনকে অনেকটা জেনে নিতে পারি। মধুসূদন যথার্থই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো উনিশ শতকে বাংলায় ও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সংঘাতমুখর নবজাগরণের যুগে বিপ্লব সৃষ্টিকারী একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন এই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং নিত্যকালীন কাব্যপ্রেরণার অগ্রদূত। বিদ্রোহী মাইকেল বাংলা কাব্যের শুধু পয়ারের শৃঙ্খলা ভাঙেননি, বাঙালির মনকেও চিরকালের মতো শৃঙ্খলামুক্ত করে দিয়ে গেছেন। বিপ্লবী মধুসূদনের সমগ্র জীবন ছিল সংগ্রামে ঘেরা। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'-এর রচয়িতা মাইকেলের জীবন ছিল মহাকাব্যের নায়কের মত বহু বৈচিত্র্যময়, ছিল নানান চড়াই-উৎরাই এবং জটিল দ্বন্দ্ব সংঘাত। বঙ্গদেশে নবজাগরণের অন্যতম মহারথী মাইকেল মধুসূদন দত্ত সব দেশে সব কালে সেইসব মানুষদের একজন, যাদের জীবন একটি দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক নির্ণয়ের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। এই রকম মানুষই হয়ে ওঠেন কালের নায়ক। এমন নায়ককে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার চেষ্টা প্রায় সব ভাষার সাহিত্যেই কমবেশি দেখা যায়। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতক থেকেই মধুসূদন চর্চার শুরু হয়ে যায়। ওই শতকেই তাঁর জীবন অবলম্বনে লেখা হয় কয়েকটি নাটক। যেমন - বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯), উৎপল দত্তের 'দাঁড়াও পথিকবর', মহেন্দ্রকুমার গুপ্তের 'মাইকেল' প্রভৃতি। বিশ শতকে এই জীবনীমূলক নাটকগুলি রচিত হলেও জীবনভিত্তিক উপন্যাস লেখা হয় একুশ শতকে এসে। লিখলেন ঔপন্যাসিক সমীরণ দাস। দীর্ঘ ১০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসেবে আমাদের কাছে আসে 'মধুময় তামরস' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির রচনার কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে 'আজকাল' পত্রিকায় মধুসূদনের উপর লেখা কভারস্টোরি পড়ে তিনি বিস্মিত, মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে যান। পরবর্তীকালে মধুসূদনকে নিয়ে স্বপন কুমারের যাত্রা দেখে স্থির করলেন যদি কখনো জীবনভিত্তিক উপন্যাস লিখেন তাহলে মধুসূদনকে নিয়েই লিখবেন। তাছাড়া পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রচুর জীবনভিত্তিক উপন্যাস লেখা হলেও বাংলা সাহিত্যে তখনো পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি জীবনভিত্তিক উপন্যাসই লেখা হয়েছিল - এটাও ঔপন্যাসিকের জীবনভিত্তিক উপন্যাস লেখার আরেকটি কারণ।

মহাকবির জীবন নিয়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস সমীরণ দাসের 'মধুময় তামরস'। উপন্যাসটির বিস্তৃতি তিন খণ্ডে মোট ১২০২ পৃষ্ঠায়। মধুসূদনের জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রিঃ থেকে মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৪৯ বছরের জীবনকালের মধ্যে কিশোর মধুসূদনের হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর তাকে সমাধি করা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনাবলী এই সুবৃহৎ উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ উপন্যাসের মূলে রয়েছে মধুসূদনের জীবন। কিন্তু উপন্যাসের মূলে মাইকেলের জীবন থাকলেও উপন্যাসটিকে ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাস বলা যায় কিনা তা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখবো।

আলোচনার প্রথমেই আমরা দেখে নেব উপন্যাসে উল্লেখিত চরিত্রগুলির মধ্যে কতগুলি চরিত্র জীবনীসম্মত বাস্তব চরিত্র। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা গৌরদাস বসাক লেনে বসে থাকা অনন্ত নামে একটি পাগলের সাথে পরিচিত হই। এরপর ধীরে ধীরে আমরা উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে - মাইকেল মধুসূদন দত্ত (উপন্যাসের নায়ক), রাজনারায়ণ দত্ত (মধুর পিতা), জাহ্নবী দেবী (মধুর মাতা), গৌরদাস বসাক (মধুর বন্ধু), ভূদেব (মধুর বন্ধু), বঙ্কু (মধুর বন্ধু), শ্যামাচরণ (মধুর বন্ধু), শিবসুন্দরী (রাজনারায়ণের দ্বিতীয় স্ত্রী), প্রসন্নময়ী (রাজনারায়ণের তৃতীয় স্ত্রী), হরকামিনী (রাজনারায়ণের চতুর্থ স্ত্রী), রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রিচার্ডসন (হিন্দু কলেজের অধ্যাপক), ডিয়ালট্রি (ধর্মপ্রচারক), আলেকজান্ডার ডাফ (ধর্মযাজক), রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, বৈদ্যনাথ (জেঠতুতো ভাই), প্যারীমোহন (জেঠতুতো ভাই), টমাস স্মিথ (ধর্মপ্রচারক), জেমস ক্যর (হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল) ডক্টর উইদার্স (হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ), কমল (রাজনারায়ণের ছোটবেলার বন্ধু), জর্জ ম্যান (মধুর বন্ধু), এগবার্ট চালস্ কেনেট (মধুর বন্ধু), রেবেকা (মধুর স্ত্রী), রিচার্ড নেইলর (সহকর্মী), হেনরিয়েটা (মধুর জীবনসঙ্গী), জর্জ হোয়াইট (হেনরিয়েটার বাবা), ফার্টনিগ (মাদ্রাস সার্কুলেটর পত্রিকার সম্পাদক), জর্জ নর্টন (অ্যাডভোকেট জেনারেল), নরেন্দ্রনাথ সেন (লিটারারি ও

ডিবেটিং সোসাইটির সম্পাদক), সিমকিনস (পত্রিকার সম্পাদক), বার্টন পাওয়েল (মাদ্রাজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক), মধুর চার সন্তান - বার্থা, ফিবি, জর্জ, জেমস, এমিলি শর্ট (জর্জ হোয়াইটের দ্বিতীয় স্ত্রী), হেনরিয়েটার দুই ভাই - উইলিয়াম, এডুইন, শ্রীনিবাস পিল্লে (সহকর্মী) প্রমুখ। উপন্যাসে ৫০টিরও অধিক চরিত্র রয়েছে। এরমধ্যে উপন্যাসের প্রথমেই উল্লেখিত অনন্ত পাগল, শ্রীনিবাস পিল্লে, কমল ও নরেন্দ্রনাথ সেন চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের কাল্পনিক সৃষ্টি। এছাড়া উপন্যাসের উল্লেখিত প্রায় সমস্ত চরিত্রই বাস্তবসম্মত চরিত্র।

'মধুময় তামরস' উপন্যাসটি রচনায় ঔপন্যাসিক জীবনীর প্রতি দায়বদ্ধতা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি বহুবিধ ভাবনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের রচনায় ঔপন্যাসিক অনেকগুলো বইয়ের সহায়তা নিলেও মুখ্য ছিল গোলাম মোরশিদের 'আশার ছলনে ভুলি', নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' ও যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থটি। উপন্যাসটি রচনায় ক্ষেত্রে জীবনীর সাথে উপন্যাসের কাহিনিগত ও তথ্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সূচনাতেই দেখা যায় পিতা রাজনারায়ণ ও মাতা জাহ্নবী দেবীর হাত ধরে যশোরের সাগরদাড়ি গ্রাম থেকে কলকাতায় পা রাখেন বালক মধু। ১৩ বছর বয়সে এসে ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। কিন্তু তার মনে সাহিত্যবোধ জাগ্রত হয় আরো আগে থেকেই। এর মূলে ছিলেন জাহ্নবী দেবী। তিনি ছোটবেলাতেই মধুকে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, পুরাণ নিজে পড়ে শুনাতেন। মধুসূদনের মধ্যে ছিল জ্ঞান অর্জনের অদম্য প্রবনতা তাই বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল তাঁর নেশা। এজন্য তাঁর বন্ধুরা তাকে 'গ্রন্থকীট' বলে ডাকত। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রতিভার অধিকারী। মধু যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন 'ভারতীয় নারীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর এই অনন্য প্রতিভার জন্য রাজনারায়ণ বসু একসময় তাকে ঈর্ষা করত। তাছাড়া মধু পঞ্চম শ্রেণী থেকে বৃত্তি পেয়ে একলাফে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন।

উপন্যাস ও জীবনী দুটি গ্রন্থানুসারেই হিন্দু কলেজে মধুর সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু ছিলেন ভূদেব। এক সময় টাকা পয়সার অভাবে ভূদেবের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। একথা শুনে মধু তাঁর জলপানির টাকা থেকে ভূদেবের বেতনের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ থেকে তাদের বন্ধু প্রীতির ঘনিষ্ঠতার অভাস পাওয়া যায়। হিন্দু কলেজে ভূদেবের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হলেও মধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল গৌর দাস বসাকের সঙ্গে। তাদের বন্ধুত্ব এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে মধু এক সময় গৌরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন –

> "গৌর, আমি বিলেত যাব। নীলনয়না, শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী কুমারীকে বিয়ে করব। আর তুমি আমৃত্যু সঙ্গে থাকবে আমার বন্ধু হয়ে। কী? থাকবে তো?"[২]

হিন্দু কলেজে মধুর সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন রিচার্ডসন। তিনি একাধারে ছিলেন বড়ো কবি ও শিক্ষক। মধু হিন্দু কলেজে এসে কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রিচার্ডসনের কাছ থেকে। কলেজের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে মধু রিচার্ডসনের নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে প্রবল সাহিত্যপ্রীতি জাগ্রত হয়। যার কারণে তিনি বড় হয়ে মহাকবি হবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেন। উপন্যাসে বারবার তাকে এই প্রতিজ্ঞার কথা বলতে শোনা যায়। একসময় মধু তাঁর বাবাকে জানিয়েছিলেন –

> "বড় হয়ে আমি কবি হতে চাই! ...শুধু কবিতা লেখা নয় - আমি বিলেতে শেকসপিয়ারের দেশে গিয়ে কবিতা লিখে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাই। বড়ো কবি হতে গেলে বিলেত যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।"[৩]

ছেলের এই কবি হওয়ার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাজনারায়ণের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি কোন কূল-কিনারা না পেয়ে মধুকে আরেকটু কাছে থেকে বোঝার জন্য তমলুকে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান নিজের ছেলে হলেও মধু অন্য কোন এক জগতের মানুষ। মধুকে দেখে তিনি কেবল অবাকই নন, শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে ছেলের জন্য এক ধন্বন্তরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এক সুন্দরী জমিদার কন্যার সঙ্গে মধুর বিয়ে ঠিক করে দিলেন।

মধুর আগে থেকেই স্বপ্ন ছিল নীলনয়না শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েকে বিয়ে করা। তাই তাঁর বিয়ে ঠিক হওয়ায় মধু খুব ঘাবড়ে যায়। কী করবেন প্রথমে বুঝে উঠতে পারলেন না। এই নিরুপায় অবস্থায় তাঁর মাথায় একটা ভাবনা কাজ করল, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার। তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে, বিয়েও আটকাবে একই সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার সুযোগও পাওয়া যাবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর সহায়তায় মধু টমাস ডেয়ালট্রি ও আলেক্সান্ডার

ডাফের সাথে পরিচিত হন। তাদের মধ্যে ডেয়ালট্রি মধুকে বিলেত যাওয়ার ভরসা দেয় এবং দীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঠিক করেন ৯ই ফেব্রুয়ারি। দীক্ষা নেওয়ার জন্য মধু প্রথমে ডেয়ালট্রির বাড়ি যান। কিন্তু মধুর বাবা তাঁর লাঠিয়াল এবং সড়কিওয়ালাদের নিয়ে মধুকে ছিনিয়ে নিতে পারেন এই ভয়ে মিশনারীরা মধুকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দুর্গের ভেতরে নিরাপদ স্থান দেন। আর তাই রাজনারায়ণ মধুকে উদ্ধার করার শত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ওল্ড চার্চে মধুর দীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়।

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর মধু আশ্রয় পায় ডেয়ালট্রির বাড়িতে। এরপর চলে যান বরানগর টমাস স্মিথের বাড়ি। নিজের বাড়িতে মা-বাবার আশ্রয়ে যতদিন ছিলেন মধু বুঝতে পারেননি বাইরের পৃথিবীটাকে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর সামনে অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব আস্তে আস্তে সবাই দূরে যেতে থাকে। গ্রন্থকীট মধুর জীবনে আসে পড়াশোনার ওপর বিপত্তি। হিন্দু কলেজের নিয়ম অনুযায়ী কোন অহিন্দু ছেলেকে এখানে পড়তে দেওয়া যায় না, যার কারণে মধুকে হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এতে মধু আরো বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। স্মিথের বাড়িতে প্রায় বছরখানেক থাকার পর মধু শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভর্তি হয় বিশপস কলেজে। যদিও বিশপস কলেজে ভর্তির একমাত্র শর্ত ছিল মিশনারী হওয়া তবুও মধু এই কলেজে ভর্তি হয়েছিল মাসিক বেতনের ভিত্তিতে। কিন্তু এইখানেও মধু তাঁর কলেজের পড়া সম্পূর্ণ করতে পারেননি, কারণ রাজনারায়ণ মধুর পড়াশোনার খরচা একটা সময় বন্ধ করে দেন। এর পেছনে রাজনারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল মধুকে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করিয়ে আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মধু কিছুতেই হিন্দু ধর্মে যেতে রাজি হলেন না। টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মধু মরিয়া হয়ে একটা চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সমস্যার কথা যখন বন্ধু এগবার্টকে জানালেন এগবার্ট তখন তাকে মাদ্রাজে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর মধু অজানা পথের সন্ধানে পাড়ি দেয় মাদ্রাজে।

অন্যদিকে রাজনারায়ণ একমাত্র ছেলের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে পরলোকে নরকবাসের চিন্তায় এবং পুনরায় পুত্র প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন শিবসুন্দরী দেবীকে। কিছুদিন পর শিবসুন্দরী দেবী মারা গেলে রাজনারায়ন তৃতীয়বার বিয়ে করে নিয়ে আসেন প্রসন্নময়ীকে এবং চতুর্থ বার বিয়ে করেন হরকামিনী দেবীকে।

মাদ্রাজে গিয়ে মধু ওয়েসলিয়ান চ্যাপেলের একটি ছোট্ট ঘরে থাকতে শুরু করেন। এগবার্ট কেনেটের বাবা চালর্স কেনেটের সহায়তায় মধু স্বল্পদিনের মধ্যেই আরফ্যান অস্যাইলামের সহকারী শিক্ষকের চাকরিও পেয়ে যান। যদিও চাকরির বেতন ছিল নিতান্তই কম মাত্র ৪৬ টাকা, তবুও একটা অপরিচিত জায়গায় টিকে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। মাদ্রাজে গিয়ে স্থির হয়ে বসার আগেই মধু বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এগবার্ট পরিবারের সহায়তায় মধু সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থ হয়ে তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এই অস্যাইলামেই মধুর সাথে পরিচয় হয় জর্জ হোয়াইট, রিচার্ড নেইলরের। এমনকি রেবেকার সাথেও পরিচিত হয় এই অস্যাইলামে এসেই। মধু প্রথম যৌবন থেকেই যে নীলনয়না সুন্দরীর স্বপ্ন দেখে এসেছেন, এবারে রক্ত-মাংসের অবয়বে সেই কল্পনার নায়িকাকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন রেবেকা রূপে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে তৈরি হয় প্রেম সম্পর্ক। একদিন এগবার্টের ঘরে বেশ কিছু সময় ওরা আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। মধু সত্তার মধ্যে ভালোবাসা প্রাপ্তির যে বাসনা ছিল, সেই ভালোবাসার সঙ্গে রেবেকার বাসনা একাত্ম হয়ে যাওয়ায় ওরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মনে হয় - পেরিয়ে যাক ঘণ্টা, মিনিট, মাস, বছর। ওরা এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে বছরের পর বছর। অনন্ত কাল, অনন্ত মায়ায়।[8] নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে চালর্স কেনেট ও নেইলরের সহায়তায় মধু-রেবেকার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

রেবেকা মধুর জীবনে আসে ভাগ্যলক্ষী, বিজয়লক্ষী হিসেবে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে মধুর সুখ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। মাদ্রাজে মধুর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজ সার্কুলেটর' পত্রিকায়। পর পর আরো তিনটি কবিতা প্রকাশ হলে মাদ্রাজ পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। তবে তিনি এই কবিতাগুলি স্বনামে লিখেননি, লিখলেন ছদ্মনামে (Timothy Penpoem)। 'মাদ্রাজ সার্কুলেটর'এর সম্পাদক মিস্টার ফার্টনিগ মধুর কবিতায় উৎসাহিত হয়ে বড় লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এদিকে মধুর জীবনে আসে আরেকটা বড় সুখবর। রেবেকা জানায় মধু বাবা হতে চলেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 321 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশে কাব্যজগতে মধুর খ্যাতি আরো বাড়তে থাকে। কিন্তু বাধা আসলো 'ক্যাপটিভ লেডি' পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে। যে ব্যক্তি ৫০ টাকা মাসিক বেতন নিয়ে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার চালাচ্ছে সে কীভাবে ২০০ টাকা খরচ করে কাব্য প্রকাশ করবে। উপায়ান্তর না পেয়ে শেষপর্যন্ত মধু গৌরকে ও বিশপস কলেজের বন্ধুদের চিঠি লিখলেন কিছু গ্রাহক জোগাড় করে দিতে। তাদের সহায়তায় 'ক্যাপটিভ লেডি' বই আকারে বের হয়। মাদ্রাজে বইটি প্রশংসা পেলেও কলকাতায় বেঙ্গল হরকরা, হিন্দু ইন্টেলিজেসিয়ার ও ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বইটি নিয়ে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এদিকে শিক্ষা বিভাগের সভাপতি বেথুন ও বন্ধু গৌর বইটি পড়ে মধুকে বাংলায় লেখার পরামর্শ দেন। ইংরেজিতে কাব্য লিখে মহাকবি হওয়ার বাসনা যে কেবল আকাশকুসুম কল্পনা এই অনুভব বেথুন ও গৌরের পরামর্শের পর আস্তে আস্তে তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে মধু প্রথম সন্তানের বাবা হয়। মেয়ের নাম রাখলেন বার্থা ব্লানস কেনেট। কেনেট পরিবার মাদ্রাজে মধুকে যেভাবে সহায়তা করেছেন সেই কৃতজ্ঞতা বসত তিনি মেয়ের নামের সঙ্গে কেনেট পদবী যুক্ত করে দিলেন।

এদিকে সিমকিনস মধুর উপর 'ইউরেশিয়ান' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। এই পত্রিকায় তিনি 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক লিখতে শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। পত্রিকা সম্পাদনার কাজ ভালোই চলছিল, এরমধ্যে একদিন মধুর কাছে রাজনারায়ণ দত্তের চিঠি আসে। সেখান থেকে মধু তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। মায়ের মৃত্যুর খবরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় না এসে থাকতে পারলেন না। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি বেশিদিন থাকেননি, যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিলেন তেমনি ঝড়ের গতিতে আবার মাদ্রাজে ফিরে যান।

এর মধ্যে মধুর পারিবারিক জীবনে আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো তাঁর দ্বিতীয় কন্যা ফিবির জন্ম। মিস্টার নর্টনের সহায়তায় মধু মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির চাকরি পেলেন। আসলে এটা ছিল হাই স্কুল, বলা হতো ইউনিভার্সিটি। এই চাকরির সাথে মধুর জীবনে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসে। কিন্তু মধুর জীবন থেকে বিপত্তি চলে যাওয়ার নয়। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি কমিটি তাকে জানিয়ে দিলেন –

> "সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য কাগজে লেখার জন্য স্কুলের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। চাকরি টিকিয়ে রাখতে গেলে সাংবাদিকতার কাজ ছাড়তে হবে!"[৫]

মধু তাদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার অনেক চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেন। স্কুলের চাকরি যেহেতু তাকে আর্থিক সচ্ছলতা দিচ্ছিল তাই তিনি পত্রিকার সম্পাদনা কাজ বন্ধ করে স্কুলের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এই অস্থির পরিস্থিতিতে রেবেকা মধুকে তৃতীয় সন্তান উপহার দেন (প্রথম পুত্র জর্জ)।

মাদ্রাজ স্কুলে এসে মধু সহকর্মী হিসেবে পেলেন জর্জ হোয়াইটকে, যার সাথে মধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। হোয়াইট তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় পর এক তরুণীকে (এমিলি শর্ট) বিয়ে করলেন। যার কারণে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। তখন সহকর্মী হোয়াইটের ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে হেনরিয়েটার প্রতি কবির সহানুভূতির প্রকাশ পায়। সেই সহানুভূতি পরবর্তীকালে প্রেমে পরিণত হয়। অন্যদিকে তাঁর কর্মজীবনে আসে আবার বিপত্তি। মাদ্রাজ স্কুল যখন সাধারণ পরিবারের ছাত্রদের জন্যও উন্মুক্ত করা হয় তখন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, যাতে করে স্কুলের আয়ও বেড়ে যায়। এর ফলে স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকের বেতন বাড়ানো হলেও শুধু মধুর বেতন বাড়ানো হল না। কারণ নেটিভদের বেতন কখনো বাড়ানো হতো না। এই অন্যায় বৈষম্য মধু মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মধুর চাকরি চলে যায়। হতাশ হয়ে মধু এসে যোগ দেয় মাদ্রাজ 'স্পেকটেটর' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে। নতুন কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরে মাইকেল ও রেবেকার চতুর্থ সন্তান - দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল জেমসের জন্ম হয়।

একদিন হঠাৎ করে কৃষ্ণমোহন গৌরের চিঠি নিয়ে মাদ্রাজে মধুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। গৌরের চিঠি থেকে মধু পিতার মৃত্যুর খবর জানতে পায়, আরো জানতে পায় তাঁর বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে লড়াইয়ের খবর। গৌর মধুকে অনুরোধ জানায় কলকাতা ফিরে তাঁর বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিতে। এদিকে হেনরিয়েটার সঙ্গে মধুর লুকানো প্রণয়লীলা রেবেকার কাছে প্রকাশ পায়। যে রেবেকা আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও

একজন কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছিলেন এমনকি সব অভাব স্বীকার করে ভালোবাসা ও সন্তান দিয়ে মাইকেলের সংসার কে ভরে দিয়েছিলেন তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে পারেননি। রেবেকা অস্থিরভাবে বলেন–

> "তুমি চলে যাও। আর কোনোদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না। না খেয়ে মরব, ভিক্ষা করব, তবুও না।"[৬]

গৌরের চিঠি পেয়ে মধু আগেই কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রেবেকার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পরে তিনি ছদ্মনামে টিকিট কেটে মাদ্রাজ থেকে চিরতরে চলে আসলেন। মধুর কলকাতা ফিরার মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'মধুময় তামরস' উপন্যাসের প্রথম খন্ড।

উপন্যাসে আকারে সবচেয়ে ছোট দ্বিতীয় খন্ডের শুরু হয় মধুর কলকাতা আগমনের মধ্য দিয়ে। মধু কলকাতা আসার উদ্দেশ্য হিসেবে জানায় –

> "বাংলা ভাষার মাধ্যমে কবিতা লিখে দেশের সেবা করা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই ! এবং মূলত সেজন্যই এখানে ফিরে আসা!"[৭]

কলকাতায় ফিরে তিনি নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে বছর দুয়েক পর সামান্য বেতনে পুলিশ কোর্টের হেড ক্লার্কের চাকরিতে যোগদান করেন। এই সময়েই মধু রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার নাট্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই রচনা করে ফেলেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এই নাটকটি নাট্য জগতে মধুকে জনপ্রিয় করে তোলে। এদিকে বিরহ সইতে না পেরে হেনরিয়েটা মাদ্রাস থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু রেবেকার সাথে মধুর বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়ায় মধু হেনরিয়েটাকে কখনো বিয়ে করতে পারেননি। 'শর্মিষ্ঠা' মধুকে পরিচিতি দিলেও লক্ষী ধরা দেয়নি। মধু বাংলা সাহিত্যে আরও বড় কিছু করার জন্য রামকুমার বিদ্যারত্নের কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন।

আস্তে আস্তে কাব্যলক্ষ্মী এসে ধরা দেয় মধুর কাছে। মহারাজা ইশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে লিখে ফেলেন দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। লিখলেন 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এরই মধ্যে জন্ম হয় হেনরিয়েটা ও মধুর প্রথম সন্তানের। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মধুকে প্রকৃত খ্যাতি এনে দিয়েছিল তাই মেয়ের নাম রাখেন শর্মিষ্ঠা। এদিকে সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে মধু জয়ী হয় ও আদালত রাজনারায়ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার মধু ও তাঁর দুই বিধবা মাকে দেয়।

বাংলায় এতগুলো সার্থক নাটক রচনা করেও মধুর মধ্যে হতাশা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল –

> "বাংলা নাটকের ভাষা মুক্ত করতে হবে। মিত্রাক্ষর ছন্দের বেড়াজাল থেকে বের করে আনতে হবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। তবেই আসবে নাটকের মুক্তি। ভাষার মুক্তি। নতুন সৃষ্টি। চর্বিতচর্বণ করে বেশিদূর যাওয়া যায় না।"[৮]

মধুর এই ভাবনায় কেউ বিশ্বাস করতে না পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখিয়ে দেলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষিত রূপ 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে। এই কাব্যে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপরই মধু তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন মহাকাব্য রচনার দিকে এগিয়ে যায়। বছর দেড়েকের পরিশ্রমে লিখে ফেললেন কবির সর্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য কীর্তি 'মেঘনাদবধ' কাব্য।

কাব্যলক্ষ্মী তাঁর কাছে ধরা দিলেও ধনলক্ষ্মী তাঁকে ধরা দিতে নারাজ। সমাজে তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও বিলাসবৈভব জীবনযাপন করেন। কিন্তু তাঁর দিন কাটাতে হয় দারিদ্রতার মধ্যে। তাই মহাকবি অসম্মানে খেদ প্রকাশ করেন। যে মধুর পকেটে টাকা কখনো বাসি হত না, হিসেব করে বা গুনে কাউকে টাকা দিতেন না, তাঁর আজ কী করুন পরিণতি -

> "বাড়ির সমস্ত খাবার শেষ। যা আছে সবই শিশুখাদ্য। গত দু'দিন মধু কিছুই খায়নি। শুধু পান করেছে বোতল বোতল বিয়ার।"[৯]

এই খন্ডে ঘটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধুসূদন রেভারেন্ড লঙের উৎসাহে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে এই অনুবাদের জন্য তাঁকে গোয়েন্দা জেরার কবলেও পড়তে হয়েছিল। দারিদ্র্যের তাড়নায় বিরক্ত হয়ে এবং দেশে যখন কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেও স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারলেন না তখন মধু সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার। যেমন ভাবনা তেমনই কাজ। মধু পিতৃসম্পত্তি বন্ধক রেখে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পয়সা জোগাড় করেন। এরই মধ্যে হেনরিয়েটা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। দুই সন্তান ও হেনরিয়েটাকে কলকাতায় রেখে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য মধুর ইংল্যান্ড যাত্রার মধ্য দিয়ে শেষ হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ড।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষ করে লন্ডন অবতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'মধুময় তামরস' উপন্যাসের তৃতীয় খন্ড। সেখানে গিয়ে বন্ধুত্ব হয় মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথের সাথে। এখানেও মধুর নজর কাড়ে বর্ণবিচ্ছেদ, বিভিন্ন এলাকার বস্তি, ছোট ছোট ঘরে গরিব লোকজনের বসবাস। শিল্পপ্রেমী মধু এক এক করে দেখে নেয় লন্ডনের বড় বড় স্থাপত্য ও প্রসিদ্ধ সব শিল্পকর্মগুলি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মধুর সংকট ঘনিয়ে আসে। যে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মধু জায়গা বন্ধক রেখেছিল, কথা হয়েছিল বছরে মধুকে তিন হাজার টাকা পাঠাবে অর্থাৎ মাসে আড়াইশো টাকা এবং কলকাতায় ওর স্ত্রী হেনরিয়েটাকে মাসে দেড়শো টাকা করে দেবে, কিন্তু সে মহাদেব কয়েকমাস পর থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাই লন্ডনের মধু ও কলকাতায় হেনরিয়েটা ভীষণ বিপদে পড়ে যায়। মধু ব্যারিস্টারি পড়ার খরচ, এমনকি খাবারের টাকা জোগাতেও কষ্ট হয়। তবুও মধুর ভাবনা –

> "বাধা তো আসতেই পারে মানুষের জীবনে। সেই বাধা অতিক্রম করে এগোনোও তো মানুষেরই ধর্ম। আমি বিপদের কথা ভেবে লড়াই থেকে কখনও পিছপা হইনি।"[১০]

অন্যদিকে টাকা ছাড়া হেনরিয়েটা সন্তানদের নিয়ে বাঁচার কোন উপায় না পেয়ে লন্ডনে মধুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে লন্ডনে মধুর অবস্থা আরো সূচনীয় হয়ে ওঠে। ধনীর দুলাল মধু অর্থাভাবে লন্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে বস্তিতুল্য একটি পাড়ায় বাড়িভাড়া করে বস্তিবাসীদের করুণার উপর ভর করে কোন রকমে বাঁচতে শুরু করেন। রেভারেন্ড লং-এর সহায়তায় এক ফরাসি সুন্দরীকে ইংরেজি শেখানোর কাজ পায়। পরবর্তীকালে এই ফরাসি সুন্দরী বিদেশে-বিভূয়ে ঋণজালে জর্জরিত মধুকে জেলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। লন্ডনে মধু এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন যে দিনের পর দিন তাঁর পরিবারকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে, এমনকি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকে একটু খাবারের জন্য ভিক্ষে পর্যন্ত করতে হয়েছে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জর্জরিত মধু বিদ্যাসাগরের কাছে চিঠি লিখে সাহায্য প্রার্থনা করেন। করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের সহায়তায় মধু ব্যারিস্টারি ডিগ্রী লাভ করে স্ত্রী-সন্তানদের বিলেত রেখে কলকাতায় ফিরে আসেন। অর্থ উপার্জনের সুবন্দোবস্ত না করেই বিদ্যাসাগরের ঠিক করা বাড়িতে না উঠে, উঠলেন কলকাতার সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল স্পেনসেসে। এমনকি ফিরে এসে মধু বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা পর্যন্ত করলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর নিজে যেচে মধুর কাছে আসেন ও মধুর সরলতায় তাঁকে ক্ষমাও করে দেন।

কিছুটা স্থিতাবস্থা আসার সাথে সাথেই মধুর জীবনে আবার আসে বিপত্তি। শ্বেতাঙ্গ ব্যারিস্টারদের তীব্র বিরোধিতায় কারণে মধুর কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার পেলেও আর পসরা জমিয়ে উঠতে পারেলেন না। এদিকে নানা দুর্ভোগ কাটিয়ে হেনরিয়েটা বিলেত থেকে সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়। আবার শুরু হয় অভাব-অনটন-অনাহার ও ঋণ জর্জরিত অবস্থা। জীবিকা অর্জনের শেষ সুযোগ ও চেষ্টা হিসেবে মধু পুরুলিয়া পঞ্চকট রাজবাড়িতে রাজকর্মী হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু সেখান থেকেও ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনো রকমে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। তারপর শুরু হয় অনাহার আর অনাহার। খালি পেটে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মধুর লিভারের চরম ক্ষতি হয়। হেনরিয়েটাও গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন মধুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু গৌরদাস এসে দেখতে পায় –

> "দরজা বন্ধ ছিল। কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে হাত দিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেছে। এবং দরজা খুলতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে ওঁর - মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, অসহায় মাইকেল সেই রক্তের ওপর শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছেন। হাঁপাচ্ছেন। অদূরে হেনরিয়েটা। তিনি সংজ্ঞাহীন। গৌর দ্রুত ঘরে ঢুকে বন্ধুর পাশে বসে কপালে হাত রাখেন। মধু ভাষাহীন চোখে গৌরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে?"[১১]

দুই-তিন দিনের ব্যবধানে মধু ও হেনরিয়েটা দুজনই মারা যায়। মারা যাওয়ার পরও মধুর শবদেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে তৈরি হয় নানান জটিলতা –

> "নানাবিধ জটিলতায় মৃত্যুর পরও দেড় দিন মধুসূদনের দেহ মর্গে পড়ে থাকে। পচনের উপক্রম হয়। কেউই বিশপের অনুমতি ছাড়া মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে সাহস পাচ্ছেন না। শেষপর্যন্ত সেন্ট জেমস গির্জার ধর্মাচার্য রেভারেন্ড ডাঃ পিটার জন জারবো সমস্ত মতামত, বিরোধিতা উপেক্ষা করে, বিশপের অনুমতির অপেক্ষা না করে মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টির উদ্যাগ নিলেন।"[১২]

উপন্যাসের তিনখন্ডে বর্ণিত উপরিউক্ত সমস্ত ঘটনাই ঔপন্যাসিক তথ্যগত মিল রেখেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তথ্যগত নৈপুণ্য রক্ষা করে তো লেখা হয় জীবনী গ্রন্থ - প্রবন্ধ গ্রন্থ, উপন্যাস নয়। উপন্যাস হতে গেলে তার সাথে প্রয়োজন চরিত্রগুলোকে মানবিক আবেদনসম্পন্ন রূপে গড়ে তোলা, প্রয়োজন সেই ব্যক্তির সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয়। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে এই কাজটিও নিপুন হাতে করেছেন। উপন্যাসটিকে বাস্তবসম্মত করার জন্য সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা ছিল খুবই জরুরী। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় হঠাৎ বড়লোক হওয়া বাবুসমাজের উশৃঙ্খলতার চিত্র, বাবুদের নিয়ে লেখা একটি কবিতায় –

> "শুধু বাবু হয় নাই আটটি লক্ষণ চাই
> তার নাম জানিবে সকলে।।
> বেশ্যাবাড়ি ছড়ি ঘড়ি বিকেলে ফিটন গাড়ি
> দিবানিশি ভাসে লালজলে।।
> গানবাদ্য কর সার মাছ ধর রবিবার
> চুল কাট অ্যালবার্ট ফ্যাশানে।।"[১৩]

তৎকালীন বাবু সমাজ মদ খেয়ে, নেশা করে বেশ্যালয়ে পড়ে থাকত, কুকুরের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই করিয়ে দিন কাটাতো। তৎকালীন হিন্দু সমাজের অবস্থাও ছিল খুব সূচনীয়। নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, তার উপর বর্ণাশ্রম প্রথা, কুলিন ব্রাহ্মণদের শত শত কুমারীকে বিয়ে করা, সহমরণ প্রথা আরো বিকৃত করেছিল ধর্মকে। উপন্যাসে মধুর মুখে বারবারই হিন্দু ধর্মের এই কুপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় –

> "যে ধর্মে বর্ণাশ্রম প্রথার মতো একটা কুৎসিত প্রথা রয়েছে, এক - একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশো-দেড়শো বিয়ে করে, মেয়েদের কোন স্বাধীনতা নেই, তাদের শিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা করা হয় না - সেই ধর্মে ফিরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"[১৪]

তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে নানান বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, শেষ পর্যন্ত আইন পাস করিয়ে সার্থকভাবে বিধবা বিয়ে দেওয়া, নারীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সিপাহী বিদ্রোহের মতো নানান ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবনিষ্ঠ ছবি, সেই সময়ের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত সব মানুষের কর্মকান্ড, মধুসূধনের জীবন প্রবাহের সাথে সাথে সবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে মানবিক আবেদন সম্পন্ন, রক্ত-মাংসের মানুষ রূপেই চিত্রিত করেছেন। এখানে চরিত্রগুলির মনের অনুভূতি, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদনের করুন পরিণতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনায় ঔপন্যাসিক যেমন ভাষাবিন্যাস করেছেন তেমনই আবেগঘন বাস্তববানুগ আবহ সৃষ্টি করেছেন যে পাঠকের চোখ অজান্তেই ভিজে ওঠে। অর্থাৎ বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জীবনীগ্রন্থে দেখা যায় না। মধু যখন কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ চলে যান তখন পিতা রাজনারায়ণের হাহাকার যেন পাঠক মনেও বেদনা জাগায় –

> "...পাত্তিছি না! আর পাত্তিছি না। কত কষ্ট করে মানুষ করলাম হারামজাদারে, বুঝল না। নিজির দেশ, আত্মীয়স্বজন, অত বড়ো বাড়ি - সব ছাড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসলাম। কীসের জন্যি? শুয়োরডা আমারে শেষ করে দেল!"[১৫]

মধুর খ্রিস্টান হওয়ার খবর পেয়ে জাহ্নবীদেবীর অবস্থা –

> "জাহ্নবীদেবীর চুল আলুলায়িত। হয়তো কয়েকদিন তেল মাখানো হয়নি। স্নানও হয়নি। নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করছেন না। একটা কাপড় দু'দিন পরে আছেন। বাড়ির কেউ সেই কাপড় পালটে দিতে আসলে তিনি তীব্র ভাষায় বকতে শুরু করছেন, আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রানি করে রাখবি? তোদের লজ্জা করে না?"[১৬]

রেবেকা ও চার সন্তানকে মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতা আসার পর মধুর অনুশোচনা, তাকে আরো জীবন্ত করে তুলে আমাদের সামনে। যেমন –

> "ভাবতে ভাবতে মধু নিজেই নিজেকে অভিশাপ দেয়, তুমি সুখী হতে পারবে না মাইকেল মধুসূদন দত্ত! শান্তি পাবে না! যেভাবে প্রিয়জনদের দুঃখ দিয়েছ, সেভাবেই সারাজীবন দুঃখ পাবে... কেঁদে ওঠে মধু। মাতাল মধু হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। নিজেকে সংযত করতে পারে না।"[১৭]

'মধুময় তারমস' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাহুল দাশগুপ্ত লিখেছেন -

> "সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা এক শিল্পীর একটু একটু করে নিজেকে গড়ে তোলার অভিযাত্রা, তাঁর বিক্ষত আত্মা ও রক্তাক্ত হৃদয়ের তীব্র আর্তিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন সমীরণ। কোথাও বাড়াবাড়ি করেন নি। অযথা নাটকীয়তার দিকে যায় নি। ...সহৃদয় ভাবে তিনি শুধু শিল্পী ও ব্যক্তি হিসেবে মধুসূদনের জীবনের সংকট, অন্তর্দাহ এবং বিপন্নতাকে বুঝতে চেয়েছেন। এ এক অত্যন্ত সৎ, খাঁটি প্রয়াস, যা লেখা হয়েছে ভেতরের তাড়না থেকে। উপন্যাসের প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন, ইতিহাস খুঁড়ে তিনি শুধু সেইটুকুই টেনে বের করেছেন। অনুতাপে দগ্ধ মধুসূদনের মনকে তিনি তুলে এনেছেন, তার মৃত বা ছেড়ে আসা মানুষের সঙ্গে তার অপরাধবোধ ও গোপন ইচ্ছাগুলোকে। সমীরণ নিছক গল্প বলতে চাননি, তিনি একজন মহান শিল্পীর বিক্ষুব্ধ অন্তর্জীবনকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, এখানেই এই বইয়ের সাফল্য।"[১৮]

দীর্ঘ ও বিস্তৃত পরিসরে লেখা হলেও উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাস এতটা আকর্ষণীয় যে, পাঠকের পক্ষে পাঠ বিরতি দেওয়া কঠিন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা এতটাই বাস্তবনিষ্ঠ যে, উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয় মধুসূদন যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের সামনেই সাহিত্যক্ষেত্রে কালজয়ী হওয়ার জন্য লড়াই করছেন। আমাদের সামনেই লড়াই করছেন দারিদ্রতার সঙ্গে। সমীরণ দাস মধুসূদনকে এতটা নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করেছেন যে, উপন্যাসে মধুসূদনের সমস্ত আবেগ, উচ্ছাস, স্বপ্ন, কল্পনা, হতাশা, বেদনা, ক্ষোভ, ব্যক্তিত্বকে নিখুঁতভাবে ও সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। জীবনীগ্রন্থ বা গবেষণাগ্রন্থ পড়ে মধুসূদন সম্পর্কে সব বিষয় পাঠকের কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে 'মধুময় তামরস' অনেক অস্পষ্টতা দূর করে দেয়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, কাহিনি বিন্যাসে চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাল্পনিক সংলাপও নির্মাণ করতে হয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনো বাহুল্য বা অপ্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

উপন্যাসের নামকরণটি লক্ষণীয়। 'মধুময় তামরস' - এই শব্দটি ঔপন্যাসিক সংগ্রহ করেছেন মধুসূদনের লেখা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি থেকে। যে কবিতায় মধুসূদন বারবার বঙ্গমায়ের কাছে অমর হয়ে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। মধুসূদন এই কালজয়ী হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম যেমন করেছেন তেমনি সার্থকও হয়েছেন। তাইতো মধুসূদনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পর আজকে এসেও আমরা মধুসূদন নিয়ে আলোচনা করছি, মধুসূদন পড়ছি। যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে ততদিন মধুসূদন থাকবেন, আর যতদিন মধুসূদন থাকবেন ততদিন মধুসূধনের জীবনভিত্তিক উপন্যাস হিসেবে 'মধুময় তামরস' প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

Reference:

১. বাগচি, মণি, মাইকেল, জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৫৯, কলকাতা - ২৯, পৃ. ১
২. দাস, সমীরণ, মধুময় তামরস (প্রথম খন্ড), অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৭
৩. তদেব, পৃ. ৬০
৪. তদেব, পৃ. ২৬৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৮২
৬. তদেব, পৃ. ৪৬৮
৭. দাস সমীরণ, মধুময় তামরস (দ্বিতীয় খন্ড), অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২৪
৮. তদেব, পৃ. ১৩০
৯. তদেব, পৃ. ২০২

১০. দাস, সমীরণ, মধুময় তামরস (তৃতীয় খন্ড), অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৮
১১. তদেব, পৃ. ৪১১
১২. তদেব, পৃ. ৪২৫
১৩. দাস, সমীরণ, মধুময় তামরস (প্রথম খন্ড), অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৯
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৩
১৫. তদেব, পৃ. ২৭
১৬. তদেব, পৃ. ১১১
১৭. দাস, সমীরণ, মধুময় তামরস (দ্বিতীয় খন্ড), অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২১০
১৮. বইয়ের দেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ পৃ. ৫৯